দৈনিক নয়া দিগন্ত

তারিখ 19 APR 2017

বিকল্প পদ্ধতিতে পার পেয়ে যাচ্ছেন বড় ঋণখেলাপিরা

■ আশরাফুল ইসলাম

বিকল্প পদ্ধতিতে পার পেয়ে যাচ্ছেন ঋণখেলাপিরা। ব্যাংকারদের যোগসাজশে ভুয়া ঋণ সৃষ্টি করে ঋণ সমন্বয় করার পাশাপাশি খেলাপিরা উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হচ্ছেন। তারা আদালতে রিট করে ঋণখেলাপির তালিকা থেকে নিজেদের নাম স্থগিত করিয়ে নিচ্ছেন। এ সুবাদে তারা ঋণখেলাপি হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ নিয়মাচারকে পাশ কাটিয়ে অন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের সুযোগ নিচ্ছেন। শুধু এটিই নয়, বছরের পর বছর শত শত কোটি টাকার ঋণ পরিশোধের দায় থেকেও তারা নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হচ্ছেন। এভাবে চার শতাধিক বড় ঋণ গ্রহীতা ঋণখেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হওয়া থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে। খেলাপি ঋণ বেড়ে যাওয়ায় ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ সক্ষমতা যেমন কমছে, তেমনি ব্যাংকের আয় ও মূলধনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এ থেকে নিষ্কৃতি পেতে ব্যাংকাররা ঋণখেলাপিদের ঋণ না দেয়ার আইন চেয়েছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে। গত সোমবার খেলাপি ঋণ বেশি এমন ২০ ব্যাংকের এমডির সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈঠকে ব্যাংকাররা এ দাবি জানিয়েছেন।

খেলাপিদের ঋণ না দেয়ার আইন চান ব্যাংকাররা

জানা গেছে, ব্যাংকিং খাত থেকে খেলাপিঋণ দূরীভূত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৩ সালে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করে। খেলাপি ঋণ আদায় বাড়াতে এবং নতুন করে কেউ ঋণ খেলাপি না হন সেজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক দু'টি পদ্ধতি গ্রহণ করে। এ দু'টি পদক্ষেপ ছিল আইনগত পদক্ষেপ এবং পদ্ধতিগত পদক্ষেপ। আইনগত পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা হয় ব্যাংক কোম্পানি আইন ও গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর মাধ্যমে। আর পদ্ধতিগত হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে ব্যাংকের ঋণ নিয়মিত ■ *১৩ পৃ: ৬-এর কলামে*

বিকল্প পদ্ধতিতে পার পেয়ে যাচ্ছেন

শেষ পৃষ্ঠার পর

মনিটরিং করে। বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে খেলাপি ঋণ পরিবীক্ষণ করে এবং ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজন মোতাবেক নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

আইনগত পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯৩কে সংশোধন করে। সংশোধিত ব্যাংক কোম্পানি আইনের ২৭ ধারা মোতাবেক কোনো ঋণখেলাপিকে নতুন করে ঋণ দেয়া যাবে না।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোন ব্যাংক থেকে কি পরিমাণ ঋণ নিয়েছে, ঋণ নিয়ে ঠিক মতো পরিশোধ করা হয়েছে কি না, অথবা গ্রাহক খেলাপি কি না তার তথ্য মজুদ করে রাখে। ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির তথ্য মোতাবেক গ্রাহক যদি ঋণ খেলাপি হয়ে থাকে তাহলে তাকে ঋণ প্রদান থেকে বিরত থাকে।

অপর দিকে গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ১৯৭২ এর মতে জাতীয় নির্বাচন ও উপজেলা নির্বাচনে কোনো ঋণখেলাপি ব্যক্তি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তাকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হলে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। এ কারণে নির্বাচনের সময় সম্ভাব্য প্রার্থী ঋণ খেলাপি হলে ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করে। অনেকে একটি নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ ডাউন পেমেন্ট দিয়ে ঋণ নবায়ন করে।

এ কারণে কোনো ব্যাংক গ্রাহককে ঋণ দেয়ার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ঋণ খেলাপি কি না তার তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে যাচাইবাছাই করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গ্রাহকদের ঋণ তথ্য দিয়ে ব্যাংক ও নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করে থাকে।

জানা গেছে, ৫০ হাজার টাকার ওপরে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন এমন গ্রাহকের ঋণতথ্য সংগ্রহ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। সাধারণত প্রতি মাসে ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে ১ কোটি টাকা বা এর ওপরে ঋণগ্রহীতাদের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি সংগ্রহ করে। আর ৫০ হাজার টাকা থেকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণগ্রহীতাদের তথ্য প্রতি তিন মাস অন্তর সংগ্রহ করা হয়। জানা গেছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে এরকম ২০ লাখ ঋণগ্রহীতার তথ্য মজুদ রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, বড় বড় ঋণখেলাপিরা এখন উচ্চ আদালতে রিট করে ঋণখেলাপির তালিকা থেকে সাময়িক সময়ের জন্য স্থগিতাদেশ নিচ্ছেন। এর ফলে ব্যাংকের ঋণ আদায় বাড়ছে না, বরং ক্ষেত্র বিশেষ খেলাপি ঋণ বেড়ে যাচ্ছে। আবার ওই একই ব্যক্তি অন্য ব্যাংক থেকে ঋণ সুবিধা নিচ্ছেন। এতে ব্যাংকের খেলাপি ঋণ বেড়ে যাচ্ছে। এমনও অভিযোগ রয়েছে, ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের উচ্চ আদালতে যেতে প্ররোচিত করছেন। ওই সূত্র জানিয়েছে, ভুয়া ঋণ সৃষ্টি করে ঋণ সমন্বয় করা হচ্ছে অহরহ। যে ব্যাংকেই তদন্ত করা হচ্ছে ওই ব্যাংকেই এমন অভিযোগ প্রমাণিত হচ্ছে। এ বিষয়ে ব্যাংকগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শনের পর সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এখন উদ্বেগের বিষয় হলো, গ্রাহকরা উচ্চ আদালতে গিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছেন। এ পরিস্থিতে বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্বেগ প্রকাশ করে খেলাপিদের আটকাতে বিকল্প পদ্ধতি বের করার উদ্যোগ নিচ্ছে। উচ্চ আদালতে রিট করে ঋণখেলাপির তালিকা থেকে সাময়িক সময়ের জন্য স্থগিতাদেশ নিলেও তারা জন্য এ সময়ের মধ্যে অন্য ব্যাংক থেকে ঋণ সুবিধা না নিতে পারেন তার পদ্ধতি খোঁজা হচ্ছে।

গত সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে বৈঠকে ঋণখেলাপিরা যেন ঋণ না পান সেজন্য নতুন আইন চান ব্যাংকাররা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে দেশের দ্বিতীয় প্রজন্মের একটি ব্যাংকের এমডি জানিয়েছেন, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে খেলাপি ঋণ আদায় বাড়ানোর জন্য চাপ দিচ্ছে। আবার পরিচালনা পর্ষদ মুনাফা বাড়ানোর চাপ দিচ্ছে এমডিদের ওপর। কিন্তু এমডিরা এ বিষয়ে একেবারে যে অসহায় তা কেউ বুঝতে চাইছে না। কারণ বড় বড় ঋণখেলাপির কাছ থেকে ঋণ আদায়ের জন্য পদক্ষেপ নিতে গেলেই তারা উচ্চ আদালতে রিট করছেন। আবার অনেক সময় বড় বড় ঋণখেলাপিরা রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে ঋণ নবায়ন করতে বলেন। খেলাপিদের আটকাতে ব্যাংক থেকে নবায়ন না করে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক তদবির করে বড় বড় খেলাপি বিশেষ বিবেচনায় ঋণ নবায়ন করে নিচ্ছেন। এভাবে বড় বড় ঋণখেলাপির কাছ থেকে ঋণ আদায়ের হার একেবারেই শূন্যে নেমে গেছে।

দৈনিক ইনকিলাব

1 9 APR 2017

ঋণের নিম্নগতিতে তারল্যের পাহাড়

তাকী মোহাম্মদ জোবায়ের

ভল্টে এক লাখ ১৭ হাজার কোটি টাকার অলস অর্থ থাকায় আমানত নেয়াই বন্ধ করে দিয়েছে 'স্বাভাবিক অভ্যাসে' অনেকগুলো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি 'বানরের তৈলাক্ত বাঁশে' আটকে পড়েছে সেই ২০১৩ সালে। সূচকটি উপরে উঠতে তো পারছেই না, বরং হর হর করে নিচে নেমে যাচ্ছে প্রতিবছর। সূচকটিকে উপরে টেনে তুলতে প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে না পারলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক ভিন্ন উপায়ে চেষ্টা চালিয়েছে একাধিকবার। তাতেও কোনো কাজ হয়নি। এতে বিনিয়োগযোগ্য অলস টাকার (তারল্য) স্তূপ জমেছে ব্যাংকগুলোতে। ভল্টে এক লাখ ১৭ হাজার কোটি টাকার অলস অর্থ থাকায় আমানত নেয়াই বন্ধ করে দিয়েছে 'স্বাভাবিক অভ্যাসে' অনেকগুলো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান। যদিও চট্টগ্রামের একটি বিতর্কিত গ্রুপের কব্জায় থাকা ব্যাংকগুলো করছে অস্বাভাবিক আচরণ। ওই গ্রুপটিকে সব টাকা বের করে দেয়ায় আমানতকারীদের টাকাই ফেরত দিতে পারছে না বেশ কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। আর্থিক খাতে বর্তমানে আমানতের সুদহার ৬ শতাংশের নিচে থাকলেও ৯ থেকে ১০ শতাংশ সুদে এখনো আমানত সংগ্রহ করছে চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানগুলো, যা আবার চলে যাচ্ছে ওই গ্রুপটির হাতে।

'বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ করতে না পারায় ব্যাংকগুলোর কাছে উদ্বৃত্ত তারল্য জমা হচ্ছে'– এমন মত বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের।

এসব অর্থের বিপরীতে ব্যাংকগুলোকে নিয়মিত সুদ গুনতে হচ্ছে উল্লেখ করে ড. সালেহউদ্দিন বলেন, 'বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ না থাকায় উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসছেন না। এর ফলে ব্যাংকগুলো বাধ্য হয়ে সরকারি বিভিন্ন বন্ডে বিনিয়োগ করছে।'

'রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন কিছুটা শান্ত মনে হলেও ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা এখনো কাটেনি'– এমন মত ব্যক্ত করেছেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেছেন, 'এ কারণে উদ্যোক্তারা ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছেন না।'

বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে বিনিয়োগ না বাড়ার কথা বলেছেন বিজিএমইএ'র সাবেক সভাপতি আবদুস সালাম মুর্শেদী। তিনি বলেন, 'বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত জমি পাওয়া যাচ্ছে না। গ্যাসের সঙ্কট এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা। বেশি দাম দিয়েও পাওয়া যাচ্ছে না নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ।'

ব্যবসায়ীরা যাতে নির্বিঘ্নে বিনিয়োগ করতে পারে সেই পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাকে এগিয়ে আসার পরামর্শ দিয়েছেন ড. সালেহউদ্দিন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১২ সাল পর্যন্ত বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ধারাবাহিকভাবে বাড়ছিল। এক পর্যায়ে ঋণের প্রবৃদ্ধিতে রাশ টানতে একাধিক সার্কুলারও জারি করতে হয় বাংলাদেশ ব্যাংককে। তবে ২০১৩ সাল থেকেই বদলে যায় চিত্র। ওই বছর ঋণের প্রবৃদ্ধিতে যে ধস নামল, আজ পর্যন্ত তা অব্যাহত আছে। বেসরকারি ঋণের হিসাবে বিদেশি উৎস থেকে সংগৃহীত ঋণ যোগ এবং ভোক্তা ঋণ সহজ করেও ঋণ প্রবৃদ্ধিতে গতি আনতে পারছে না বাংলাদেশ ব্যাংক।

২০১০ সালে শেয়ারবাজারে ধস, এর পরপরই আবাসন খাতে বিপর্যয় এবং আন্তর্জাতিক মন্দার সরাসরি প্রভাব পড়ে দেশের শিল্প-বাণিজ্যে। এরপর রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তায় টালমাটাল হয়ে ওঠে অর্থনীতি। এর উপর একের পর এক প্রকাশ পেতে থাকে দেশের ইতিহাসের বড় বড় ঋণ কেলেঙ্কারি। এর প্রেক্ষিতে ঋণ প্রদানে কঠোরতা আরোপ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ প্রদানে শিথিল হয়, কেটে যায় রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা– তখন বেসরকারি খাতের বিনিয়োগে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে সামনে আসে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। কোনো উপায়েই ঋণের প্রবৃদ্ধি বাড়াতে না পেরে ৪ এপ্রিল সার্কুলার জারি করে ভোক্তা ঋণের লিমিট প্রায় দ্বিগুণ করে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০১২ সালের জানুয়ারিতে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবাহ বেড়েছিল ২৩ দশমিক ৫৯ শতাংশ। পরের বছরের জানুয়ারিতে এই হার হঠাৎ কমে ১৩ দশমিক ৭৮ শতাংশে নেমে যায়। ২০১৪ সালে ঋণের প্রবাহে গতি আরো কমে। জানুয়ারিতে এতে প্রবৃদ্ধি হয় মাত্র ১১ দশমিক ১৭ শতাংশ। এর প্রেক্ষিতে অফশোর ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিদেশি উৎস থেকে বেসরকারি খাতে নেয়া ঋণ মোট বেসরকারি ঋণের সঙ্গে যোগ করে

পৃঃ ১২ কঃ ৮

ঋণের নিম্নগতিতে তারল্যের পাহাড়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হিসাব করা শুরু করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সার্কুলার জারি করে শিথিল করে ভোক্তা ঋণ। এতেও কাজ হয় না। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কমে হয় মাত্র ১০ দশমিক ৪২ শতাংশ। গতবছরের জানুয়ারিতে এই হার আরো কমে দাঁড়ায় ১০ দশমিক ৩০ শতাংশে। তবে আশার দিক হলো, এ বছরের জানুয়ারিতে এই ঋণ প্রবাহে কিছুটা গতি এসেছে; প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১২ দশমিক ৯১ শতাংশ। যদিও তা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অনেক কম। বাংলাদেশ ব্যাংক চলতি অর্থবছরের মুদ্রানীতিতে ২০১৭ সালের জুন নাগাদ অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৬ দশমিক ৪ শতাংশ নির্ধারণ করেছে। তবে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গড় প্রবৃদ্ধি মাত্র সাড়ে ৪ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এ বছরের জানুয়ারিতে ঋণপ্রবাহ কিছুটা বাড়ার মূল কারণ বিদেশি উৎস থেকে ঋণ প্রবাহ বাড়া। দেশের বেসরকারি খাতে এ পর্যন্ত ৮০ হাজার কোটি টাকা ঋণ এসেছে বিদেশি উৎস থেকে। তাই সার্বিক ঋণের প্রবাহ বাড়লেও দেশের ব্যাংকিং খাতে ঋণ বিতরণ বাড়েনি এক টাকাও।

এতে 'দেশের ব্যাংকগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে' উল্লেখ করে প্রাইম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমেদ কামাল খান চৌধুরী বলেন, 'তবে এর মাধ্যমে উদ্যোক্তারা কম সুদে ঋণ পাচ্ছেন যা দেশের অর্থনীতির জন্য ভালো।'

চলতি অর্থবছরের শুরুতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির চিত্র পাওয়া গেছে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) হিসাবেও। সর্বশেষ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, জানুয়ারি থেকে মার্চ সময়ে বিনিয়োগ আগের তিন মাসের তুলনায় (অক্টোবর-ডিসেম্বর) বেড়েছে ৫৫ দশমিক ২৩ শতাংশ। এ সময় স্থানীয় বিনিয়োগ ২৬ দশমিক ৮৬ শতাংশ এবং বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে ১৩৫ দশমিক ৭৬ শতাংশ। এ বছরের প্রথম তিন মাসে বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ ৩৩ হাজার ৯৭৩ কোটি টাকা। অন্যদিকে গত বছরের শেষ তিন মাসে এই অর্থের পরিমাণ ছিল ২১ হাজার ৬৯২ কোটি টাকা।

তবে এই প্রবৃদ্ধিতে সন্তুষ্ট হওয়ার কোনো কারণ দেখছেন না বিশ্লেষকরা। কারণ, ২০২০ সাল নাগাদ ৮ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে বিনিয়োগের হার জিডিপির ২৬ দশমিক ৬ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। অথচ এখন পর্যন্ত এই হার ২২ শতাংশেই আটকে আছে।

এদিকে ব্যাংকগুলোর জন্য 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' হয়ে দেখা দিয়েছে সরকারের পূর্বের ঋণ পরিশোধ। বাজেট ঘাটতি পূরণে সরকার ব্যাংক থেকে ঋণ তো নিচ্ছেই না, উল্টো প্রায় ২৬ হাজার কোটি টাকা পরিশোধ করেছে গত ৯ মাসে। অথচ চলতি অর্থবছরের জন্য সরকার ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে ৩৮ হাজার ৯৩৮ কোটি টাকা ধার নেয়ার ঘোষণা ছিল বাজেটে। উচ্চসুদের সঞ্চয়পত্র থেকে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৭০ ভাগ বেশি ঋণ আসায় আপাতত ব্যাংকবিমুখ সরকার।

এদিকে ঋণের প্রবৃদ্ধি বাড়িয়ে মুদ্রানীতির লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যাংকগুলোকে বারবার তাগাদা দিয়ে আসছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। 'ব্যাংক ঋণ বিতরণ করতে ব্যর্থ হলে এর দায় ব্যাংকগুলোকেই নিতে হবে'– এমন কথা বলেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহা. রাজী হাসান। তিনি আশার বাণী শুনিয়ে বলেন, 'মুদ্রানীতির লক্ষ্যগুলো অর্জনে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বহুমুখী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এগুলো বাস্তবায়ন হলে ঋণপ্রবাহ আরো বাড়বে।'

দৈনিক ভোরের কাগজ 19 APR 2017

ইপিবির হালনাগাদ প্রতিবেদন

কৃষিপণ্য রপ্তানিতে ৯ মাসে আয় বেড়েছে ২.৯৭ শতাংশ

কাগজ প্রতিবেদক : ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে কৃষিপণ্য রপ্তানিতে আয় হয়েছে ৪০ কোটি ৯০ লাখ মার্কিন ডলার বা প্রায় ৩ হাজার ৩১৬ কোটি টাকা; যা এ সময়ের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৮ দশমিক ১৯ শতাংশ কম। তবে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রথম ৯ মাসের তুলনায় এ খাতের রপ্তানি আয় ২ দশমিক ৯৭ শতাংশ বেড়েছে।

বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

এতে আরো জানানো হয়েছে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কৃষিপণ্য রপ্তানিতে আয় হয়েছিল ৫৯ কোটি ৬০ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ খাতে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬০ কোটি ৮০ লাখ মার্কিন ডলার।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে চা রপ্তানিতে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১১ লাখ মার্কিন ডলার. এর বিপরীতে এ খাতে ৩৪ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার; যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২১৬ দশমিক ৩৬ শতাংশ বেশি। একইসঙ্গে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে এ খাতের আয় ১৩০ দশমিক ৪৬ শতাংশ বেড়েছে; আগের অর্থবছরের জুলাই-মার্চ মেয়াদে চা রপ্তানিতে আয় হয়েছিল ১৫ লাখ ১০ হাজার মার্কিন ডলার। জুলাই-মার্চ মেয়াদে সবজি রপ্তানিতে ৬ কোটি ৫৯ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও এ সময়ে আয় হয়েছে ৫ কোটি ৮২ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার; যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১১ দশমিক ৬৩ শতাংশ কম। তবে আগের অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসের তুলনায় এ খাতের রপ্তানি আয় ১১ দশমিক ৮০ শতাংশ বেশি; ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ সময়ে সবজি রপ্তানিতে আয় হয়েছে ৫ কোটি ২১ লাখ ৩০ হাজার মার্কিন ডলার।

> ২০১৫-১৬ অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে এ খাতের আয় ১৩০ দশমিক ৪৬ শতাংশ বেড়েছে; আগের অর্থবছরের জুলাই-মার্চ মেয়াদে চা রপ্তানিতে আয় হয়েছিল ১৫ লাখ ১০ হাজার মার্কিন ডলার

চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে তামাক রপ্তানিতে আয় হয়েছে ৩ কোটি ৯৪ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার; যা এ সময়ের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩ দশমিক ৮৩ শতাংশ কম। একইসঙ্গে আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় এ খাতের আয় ১৩ দশমিক ০৫ শতাংশ কমেছে; ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তামাক ও তামাকজাত পণ্য রপ্তানিতে আয় হয়েছিল ৪ কোটি ৫৩ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ মেয়াদে ফল রপ্তানিতে আয় হয়েছে ৬ লাখ ৯০ হাজার মার্কিন ডলার; যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৯৫ দশমিক ৬২ শতাংশ এবং আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৯৬ দশমিক ২৬ শতাংশ কম। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে ফল রপ্তানিতে আয় হয়েছিল ১ কোটি ৮৪ লাখ ৩০ হাজার মার্কিন ডলার।

আলোচ্য সময়ে মসলা জাতীয় পণ্য রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ২ কোটি ৪১ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার। এ সময়ের মধ্যে এই খাতে আয় হয়েছে ২ কোটি ৪৯ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার; যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩ দশমিক ১৮ শতাংশ কম। তবে গত অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসের এ খাতের রপ্তানি আয়ের তুলনায় চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসের আয় ২১ দশমিক ১১ শতাংশ বেড়েছে; ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ মেয়াদে মসলা জাতীয় পণ্য রপ্তানিতে আয় হয়েছিল ২ কোটি ১১ লাখ ১০ হাজার মার্কিন ডলার।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে শুকনো খাবার রপ্তানিতে আয় হয়েছে ৭ কোটি ৬৭ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার; যা এ সময়ের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৬ দশমিক ৯২ শতাংশ বেশি। একই সঙ্গে আগের অর্থবছরের একই সময়ের আয়ের তুলনায় এ খাতের আয় ১৫ দশমিক ৮৮ শতাংশ বেড়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে শুকনো খাবার রপ্তানিতে আয় হয়েছিল ৬ কোটি ৬২ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার। অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে অন্যান্য কৃষিপণ্য রপ্তানিতে আয় হয়েছে ২০ কোটি ৫৩ লাখ মার্কিন ডলার। যা এ সময়ের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৭ দশমিক ৫৩ শতাংশ কম। তবে আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় এ খাতের আয় ৯ দশমিক ১৭ শতাংশ বেড়েছে; ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ মেয়াদে অন্যান্য কৃষিপণ্য রপ্তানিতে আয় হয়েছিল ১৮ কোটি ৮০ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার।

দৈনিক সংবাদ

1 9 APR 2017

খুলনায় কৃষি ব্যাংকের ২০ শাখায় খেলাপি ঋণ ৪৯ কোটি টাকা

শুভ্র শচীন, খুলনা

খুলনায় কৃষি ব্যাংকের ২০টি ব্রাঞ্চে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৪৯ কোটি টাকা। ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে খেলাপির সংখ্যা ১৮ হাজার ৫৫ জন। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ফসলে পোকার আক্রমণ, ফসল নষ্ট ও প্রভাবশালী মহলের ঋণ পরেশোধে অনীহার কারণে খেলাপি ঋণের সংখ্যা বাড়ছে। এসব টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেগ পেতে হচ্ছে। যার মধ্যে প্রভাবশালী মহল ঋণ পরিশোধ করতে চায় না বলে ব্যাংকের কর্মকর্তাদের অভিযোগ। দীর্ঘদিনের ঋণীদের কয়েক দফা নোটিশ প্রদান করেও না পেয়ে তাদের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৬২৯টি মামলা দায়ের করেছে কৃষি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। ব্যাংকের মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, খুলনা জেলায় ব্যাংকের ২০টি শাখা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে পাইকগাছা, শাহপুর, লবণচরা, দাকোপ, দৌলতপুর, ফুলতলা, জায়গীর মহল (কয়রা), তেরখাদা, ডুমুরিয়া, বটিয়াঘাটা, রূপসাঘাট, বিরাট (বটিয়াঘাটা), বারাকপুর (দিঘলিয়া), জামিরা (ফুলতলা), কয়রা, কাজদিয়া (রূপসা), কেডিএ, নিউমার্কেট, চাঁদখালী (পাইকগাছা) ও নলিয়ান (দাকোপ)। ব্যাংকের এসব শাখায় ১ কোটি ৩৬ হাজার ১৫৪ জন গ্রাহক রয়েছে। যার মধ্যে ১০ টাকার আমানতের গ্রাহক রয়েছে প্রায় ৮০ হাজার। এর মধ্যে শুধুমাত্র ঋণগ্রহীতা রয়েছে ৪৪ হাজার ৪৫৪ জন। এদের ঋণের পরিমাণ ৩৮৬ কোটি টাকা। ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে খেলাপি রয়েছে ১৮ হাজার ৫৫ জন। আর খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৪৯ কোটি টাকা। এ বছর খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেশি হয়েছে। এবার খেলাপি ঋণের পরিমাণ প্রায় ১৫ কোটি টাকা। গেলবছর অনাবৃষ্টির কারণে কৃষক, চাষি, খামারিরা লোকসানের কবলে পড়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

দিঘলিয়া উপজেলার বারাকপুর ব্রাঞ্চের ব্যবস্থাপক এমএম শহিদুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘদিনের ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে কিছুটা দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে। তার ব্রাঞ্চে ১৮ হাজার গ্রাহক রয়েছে। এর মধ্যে ১ কোটি ৬০ লাখ টাকা ঋণখেলাপি রয়েছে। তিনি বলেন, গতবছর অতিবৃষ্টির কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। যে কারণে কৃষকরা ঋণের টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হচ্ছে। তবে এবার ভালো ফসল হলে তারা এসব টাকা পরিশোধ করবে। শাহপুর ব্রাঞ্চের ব্যবস্থাপক মশিউর রহমান বলেন, তার ব্রাঞ্চে খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমেছে। ৩২ লাখ টাকার মতো ঋণখেলাপি রয়েছে। যা আদায়ে চেষ্টা চলছে। খুলনা কৃষি ব্যাংকের মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো. টিপু সুলতান এ প্রতিবেদককে জানান, ব্যাংকের ২০টি শাখায় ১৮ হাজার ৫৫ জন ঋণগ্রহীতার কাছে খেলাপি ঋণের পরিমাণ প্রায় ৪৯ কোটি টাকা। গ্রহীতাদের ঋণের টাকা আদায়ে মাঠ পর্যায়ে ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও মাঠকর্মীরা কাজ করছেন। জেলার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মাঠে ক্যাম্পের মাধ্যমে এসব অর্থ আদায়ের কাজ চলছে। অনেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাগিদ দেয়া হচ্ছে। দীর্ঘদিনের ঋণীদের নোটিশ প্রদান করা হচ্ছে। আর যারা ঋণ পরিশোধে অনীহা প্রকাশ করেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৬২৯টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তিনি বলেন, গেলবছর অতিবৃষ্টির কারণে এবার খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়েছে। এ বছরই প্রায় ১৫ কোটি টাকা ঋণখেলাপি হয়েছে। তবে এ বছর ফসল ভালো হলে এসব ঋণের টাকা আদায় হবে বলে তিনি আশাবাদী।

দৈনিক প্রথম আলো 19 APR 2017

বাড়ি নির্মাণে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ

ফখরুল ইসলাম ❋

বাড়ি নির্মাণে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ দেবে রাষ্ট্রীয় সংস্থা বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশন (বিএইচবিএফসি)। সংস্থাটি এ ছাড়া ঋণের সুদের হার কমাবে এবং প্রথমবারের মতো বাড়ি নির্মাণে কৃষকদের ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঋণ দেবে

ঋণের সীমা ও আওতা বৃদ্ধি এবং সুদের হার কমানোর জন্য বিএইচবিএফসির গত ফেব্রুয়ারির এ প্রস্তাব সম্প্রতি অনুমোদন করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়. অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে

বিএইচবিএফসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) দেবাশীষ চক্রবর্তী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমাদের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। এখনো চিঠি পাইনি। আশা করছি, এ সপ্তাহের মধ্যে পেয়ে যাব।' চিঠি পাওয়ার পর বিএইচবিএফসি পর্ষদ নতুন করে একটি নীতিমালা করবে, যা আগামী ১ জুলাই থেকে কার্যকর করা হবে বলে জানান দেবাশীষ চক্রবর্তী।

বিএইচবিএফসি অর্থ মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে, বাজার চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে ঋণের সীমা বৃদ্ধি, সুদের হার কমানো এবং নতুন পাঁচটি ঋণপণ্য চালু করা দরকার। বর্তমানে যেসব ঋণ দেওয়া হয়, নামকরণের দিক থেকেও সেগুলো সেকেলে। বিদ্যমান পরিস্থিতি দিয়ে 'সবার জন্য আবাসন' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

বিএইচবিএফসিতে বর্তমানে সাধারণ, গ্রুপ, ফ্ল্যাট, বর্ধিত, ২০ বছর মেয়াদি মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত, পাঁচ বছর মেয়াদি বিশেষ এবং সেমিপাকা, এমন সাত ধরনের ঋণ চালু আছে। এখন বাড়ি নির্মাণে একক, গ্রুপ এবং ফ্ল্যাট কেনা—এই তিন ধরনের ঋণ কর্মসূচি চালু হবে।

পাশাপাশি নতুন ঋণ কর্মসূচি চালু করা হবে অনাবাসী বাংলাদেশি, পল্লি জনগণ ও কৃষকের আবাসন এবং আবাসন উন্নয়ন ও আবাসন মেরামত ঋণ কর্মসূচি—এই পাঁচ ধরনের।

এককভাবে বাড়ি নির্মাণে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মেট্রোপলিটন এলাকার অতি উন্নত এলাকায় বর্তমানের ৫০ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ কোটি টাকা, দুই মহানগরীর অন্যান্য উন্নত এলাকায় ৫০ লাখ থেকে বাড়িয়ে ৮০ লাখ এবং টঙ্গী, সাভারসহ দেশের সব বিভাগীয় ও জেলা শহরে ৪০ লাখ থেকে বাড়িয়ে ৬০ লাখ টাকা করা হয়েছে।

গ্রুপ বা দলগতভাবে বাড়ি নির্মাণে ঋণের সীমা দুই মহানগরীর অতি উন্নত এলাকায় গ্রুপের প্রত্যেকের জন্য বর্তমানের ৫০ লাখ থেকে বাড়িয়ে ৬০ লাখ টাকা করা হয়েছে। আগের মতোই দুই মহানগরীর অন্যান্য [illegible] ৫০ লাখ এবং টঙ্গী, সাভারসহ বিভাগীয়-জেলা পর্যায়ে ৪০ লাখ টাকা রাখা হবে।

ফ্ল্যাট কেনার জন্য আগে সব এলাকার জন্যই সর্বোচ্চ ৪০ লাখ টাকা ঋণ দেওয়া হতো। এখন দেওয়া হবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের অতি উন্নত এবং অন্যান্য উন্নত এলাকার জন্য ৮০ লাখ টাকা। এ ছাড়া টঙ্গী, সাভারসহ বিভাগীয় ও জেলা শহরে ফ্ল্যাট কিনতে দেওয়া হবে ৬০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ।

সুদের হার বাড়ি নির্মাণে ৯ দশমিক ৫ শতাংশ, ফ্ল্যাট কেনায় ১০ শতাংশ এবং টঙ্গী, সাভারসহ সব বিভাগীয় শহরে বাড়ি নির্মাণে ৮ দশমিক ৫ শতাংশ করা হবে।

আবাসন খাতের সংগঠন রিহ্যাবের প্রথম সহসভাপতি লিয়াকত আলী ভুঁইয়া বিএইচবিএফসি তথা সরকারের নতুন উদ্যোগকে স্বাগত জানান। *প্রথম আলোকে* তিনি বলেন, দেরিতে হলেও সিদ্ধান্তটি এসেছে, যা একদিকে দেশের আবাসন খাতকে চাঙা করবে, অন্যদিকে [illegible] গ্রাহকেরা।

দৈনিক জনকণ্ঠ

19 APR 2017

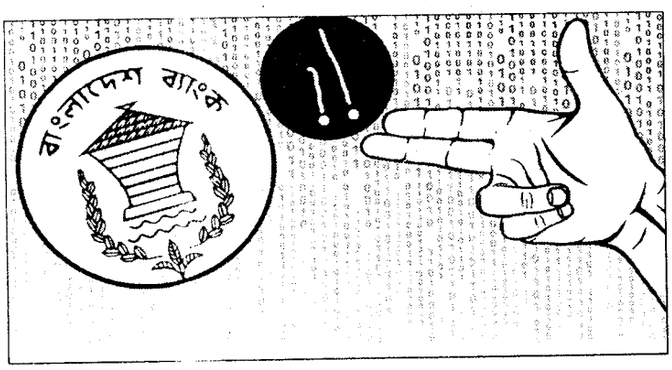

অভিযোগটি গুরুতর বাংলাদেশ ব্যাংককে এখনই তৎপর হতে হবে

নিরঞ্জন রায়

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের অর্থ জালিয়াতির এক বছরের অধিক সময় পর হয়ে গেলেও এর অধিকাংশ অর্থ উদ্ধারে তেমন কোন সন্তোষজনক অগ্রগতি নেই। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পরিবর্তন এবং তদন্ত প্রতিবেদন ছাড়া তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা আমরা শুনিনি। সেই তদন্ত প্রতিবেদন আমাদের নিজেদের উপকারে না আসলেও প্রতিপক্ষের বিশেষ করে অরসিবিসি (রিজ্যাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং কর্পোরেশন) ব্যাংকের জন্য ভাল ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কেননা আরসিবিসি ব্যাংক এই তদন্ত প্রতিবেদনের অজুহাত দিয়েই অর্থ জালিয়াতির সমস্ত দোষ বাংলাদেশ ব্যাংকের ওপর চাপিয়ে অর্থ ফেরত না দেয়ার বাহানা করে চলছে। তবে খোয়া যাওয়া অর্থ আদায়ে অগ্রগতি না হলেও বিষয়টি নিয়ে কথার জোয়ার বয়ে গেছে অনেক এবং এখনও বয়ে চলছে। এমনকি কখনও কখনও অতিকথন হয়েছে অবলীলায়। এই অতিকথন যে অনেক সময় আমাদের ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে তাও আমরা ভুলে যাই। আশার কথা এই যে, আমাদের অর্থমন্ত্রী মহোদয় বিষয়টি এখন গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন এবং এই চুরি যাওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। অর্থমন্ত্রী অবশ্য এরকম আশার বাণী এর আগেও অনেক শুনিয়েছেন। কিন্তু অর্থ উদ্ধারের ব্যাপারে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ আমরা তাকে নিতে দেখিনি।

অর্থমন্ত্রী যখন এমন দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন ঠিক তখনই যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সূত্র থেকে আরও দুটো মন্তব্য এসেছে। আমেরিকার এফবিআইয়ের কর্মকর্তা ল্যামনট শিলার এই অর্থ কেলেঙ্কারির তদন্ত কাজের সঙ্গে নিয়োজিত ছিলেন বলে দাবি করেছেন এবং বর্তমানে ফিলিপাইনের আমেরিকার এ্যামবেসিতে লিগ্যাল এ্যাটাসি হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি সম্প্রতি ম্যানিলায় সরাসরি বাংলাদেশকে দোষারোপ করে বলেছেন যে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মদদে এই অর্থ জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছে। এর কয়েকদিন আগেই আমেরিকার ওয়াশিংটনের এক সূত্রের বরাত দিয়ে জানানো হয়- বাংলাদেশ ব্যাংকের এই অর্থ হ্যাকিংয়ের সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার হ্যাকাররা জড়িত। এই অভিযোগ দুটো খুবই গুরুতর এবং সুদূরপ্রসারী এক চক্রান্তেরই অংশ বলে মনে হয়। কেন্দ্র কেন এফবিআই কর্মকর্তা কখনই এভাবে জনসমক্ষে খোলামেলা মন্তব্য করেন না। তার ওপর যদি সরাসরি তদন্ত কাজের সঙ্গে জড়িত থাকেন তাহলে তো মুখই খোলেন না। সেখানে ম্যানিলায় এভাবে প্রকাশ্যে মন্তব্য করে হুঁশিয়ারি উচ্চারণের পিছনে কোন দুরভিসন্ধি বা রহস্য থাকা মোটেই অমূলক নয়। আরেক অভিযোগে এই হ্যাকিংয়ের সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার নাম জুড়ে দেয়া হয়েছে স্বয়ং আমেরিকা থেকেই। অথচ দুনিয়ার সবাই জানে উত্তর কোরিয়ার ওপর সর্বাত্মক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা বা স্যাংশন আরোপ করা আছে। পৃথিবীর যে দু-একটি দেশের ওপর সবচেয়ে কঠিন অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা জারি আছে তার মধ্যে উত্তর কোরিয়া অন্যতম। এই নিষেধাজ্ঞা এমনই কঠোর যে, উত্তর কোরিয়া এবং সেই দেশের কোন নাগরিক বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোনরকম লেনদেন করা যাবে না, যদি কোন সংঘটিত লেনদেনের সঙ্গে উত্তর কোরিয়া বা সেই দেশের নাগরিকের কোনরকম সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায় তাহলে সেটা নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের পর্যায় পড়বে এবং এজন্য সেই লেনদেনের সঙ্গে জড়িত দেশ ও প্রতিষ্ঠানকে চরম মূল্য দিতে হবে। অতীতে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের অভিযোগে বিশ্বের অনেক ক্ষমতাধর দেশের বৃহৎ ব্যাংকগুলোকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার জরিমানা গুনতে হয়েছে।

একথা সবাই জানে যে, যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের ৮১ মিলিয়ন ডলার জালিয়াতির মাধ্যমে ফিলিপিন্সে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। এই অর্থের চূড়ান্ত লেনদেনও সম্পন্ন করা হয়েছে ফিলিপিন্সের বাণিজ্যিক ব্যাংক রিজ্যাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং কর্পোরেশনের এক শাখায়। মূলত আরসিবিসি ব্যাংক জালিয়াতির এই অর্থ তাদেরই এক শাখা থেকে প্রদান করেছে। যদি আমেরিকার ওয়াশিংটন থেকে উত্থাপিত বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের অর্থ আত্মসাতের সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার হ্যাকারদের জড়িত থাকার অভিযোগ সত্য হয় তাহলে তো এটা প্রমাণিত যে, ফিলিপিন্সের আরসিবিসি ব্যাংক সুস্পষ্টভাবে নিষেধাজ্ঞা বা স্যাংশন অমান্য করেছে। কেননা ফিলিপিন্সের এই ব্যাংকই উত্তর কোরিয়ার হ্যাকারদের উক্ত অর্থ প্রদানে সহায়তা করেছে। সুতরাং ফিলিপিন্সের সেই বাণিজ্যিক ব্যাংক, আরসিবিসি ব্যাংক, যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘ এবং অন্যান্য দেশ ও সংস্থা কর্তৃক আরোপিত অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করেছে। আমেরিকাসহ নিষেধাজ্ঞা আরোপকারী দেশ এবং সংস্থার উচিত ছিল এই আরসিবিসি ব্যাংকের ওপর নিষেধাজ্ঞা অমান্যের অপরাধে চরম শাস্তি প্রদান করা, যেমনটা তারা ইতোপূর্বে বিশ্বের অনেক বৃহৎ ব্যাংকের ওপর করেছে। অথচ সেদিকে অগ্রসর না হয়ে প্রথমে উত্তর কোরিয়ার নাম জুড়ে দিয়ে এখন বাংলাদেশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশের হেতু কি হতে পারে? তাহলে কি ক্রমান্বয়ে এই অর্থ কেলেঙ্কারির সঙ্গে বাংলাদেশ ও উত্তর কোরিয়াকে জড়িয়ে একটি চক্রান্তের জাল বিস্তার করার চেষ্টা চলছে, যাতে করে খুব সহজেই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা যায়? আর এই অভিযোগ এনে খুব সহজেই বাংলাদেশের ওপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার পথও প্রশস্ত হয়ে থাকবে। এই চক্রান্তের জাল বিস্তারের সময়টাও খুবই বিবেচ্য বিষয়। কেননা আর মাত্র বছর দেড়েক পরেই বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এবার সকল দলের অংশগ্রহণে সবার কাছে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলেই সকলের প্রত্যাশা। সেই নির্বাচনে যদি উন্নত বিশ্বের বিশেষ করে আমেরিকার পছন্দের কোন দল ক্ষমতায় না আসে তাহলে সেই সরকারকে কাবু করার জন্য তথাকথিত এই নিষেধাজ্ঞা অমান্যের অস্ত্রটি সুন্দরভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমনটা ইতোপূর্বে জিএসপি সুবিধা বাতিলের ক্ষেত্রে হয়েছিল। তাই যুক্তরাষ্ট্রের ভিতর থেকে যে দুটো অভিযোগ তোলা হয়েছে তা খুবই গুরুতর এবং ভয়াবহ। এটিকে হালকাভাবে নেয়া বা এড়িয়ে যাওয়া মোটেই সমীচীন হবে না। তাই আর কালবিলম্ব না করে বাংলাদেশ ব্যাংকের উচিত হবে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের ৮১ মিলিয়ন ডলার জালিয়াতির মাধ্যমে ফিলিপিন্সে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। এই অর্থের চূড়ান্ত লেনদেনও সম্পন্ন করা হয়েছে ফিলিপিন্সের বাণিজ্যিক ব্যাংক রিজ্যাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং কর্পোরেশনের এক শাখায়। মূলত আরসিবিসি ব্যাংক জালিয়াতির এই অর্থ তাদেরই এক শাখা থেকে প্রদান করেছে

এই রিজার্ভ জালিয়াতির ঘটনা নিয়ে আমরা অনেক কথা বলেছি; কিন্তু অর্থ উদ্ধারের জন্য কোনরকম আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিনি। এমনকি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন আইনজীবীও নিয়োগ করিনি। বিশ্বে আর্থিক জালিয়াতির ঘটনা মোটেই নতুন নয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনা নতুন হলেও বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অর্থ জালিয়াতির মাধ্যমে খোয়া যাওয়ার ঘটনা হরহামেশাই ঘটছে। আর এসব খোয়া যাওয়া অর্থ উদ্ধারও হচ্ছে আইনী লড়াইয়ের মাধ্যমে। এমনকি আমাদের ব্যক্তিজীবনে সামান্য অর্থও যদি কোন কারণে ব্যাংকের হিসাব থেকে এদিক-ওদিক হয় তাহলে সেই অর্থ ফিরে পেতে আইনী লড়াইয়ের হুমকি দিয়ে চাপ সৃষ্টি করতে হয়। আইনী লড়াই ছাড়া জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনার নজির খুব একটা নেই। অথচ এই অমোঘ সত্যটি বাংলাদেশ ব্যাংক কেন যেন বুঝতে চাইছে না। আজ প্রায় দেড় বছর হতে চলল বাংলাদেশ ব্যাংক এদিকে একেবারেই অগ্রসর হয়নি। আর এই কারণেই আরসিবিসি ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের ওপর দোষ চাপিয়ে এই অর্থ ফেরত না দেয়ার হুমকি দেয়ার সাহস পেয়েছে। একইভাবে এফবিআইয়ের কর্মকর্তা বলতে সাহস পেয়েছেন যে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মদদে অর্থ কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটেছে। কেননা সংক্ষুব্ধ পক্ষ যদি ক্ষতিপূরণ চেয়ে আইনের আশ্রয় না নেয় তাহলে তাদের নিজের দুর্বলতাই প্রকাশ পায় এবং অন্যরা সেই সুযোগ নিবে এটাই স্বাভাবিক। এই বাস্তবতা যেমন ব্যক্তিজীবনে, তেমনি রাষ্ট্রীয় জীবনেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনা এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমি ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকায় প্রায় এক ডজনের বেশি কলাম লিখেছিলাম। আমেরিকাভিত্তিক এ্যান্টি মানিলন্ডারিং বিশেষজ্ঞ সংস্থার একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে এবং নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে আমি সেসব কলামে স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছিলাম যে, এই অর্থ জালিয়াতির ঘটনার জন্য কার কার দায়িত্ব কতটুকু এবং কারা কতটুকু দায়ী। এটাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলাম যে, এই ঘটনার কারণে আমেরিকার প্রচলিত ইউএস প্যাট্রিয়ট এ্যাক্ট ২০০১ এবং ইউএস ক্রিমিনাল মানি লন্ডারিং এ্যান্ড সিভিল ফরফিচার এ্যাক্ট ১৯৮৬-এর কোন কোন ধারার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন হয়েছে। যে কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক আমেরিকার আদালতে মামলা করে যথাযথ প্রতিকার পেতে পারে। লেখাগুলো পাঠ করে অনেক সাধারণ পাঠক আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে ইমেইল পাঠালেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে লেখাগুলো এসেছিল কিনা জানা নেই।

ইতোমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাই আর মোটেই কালবিলম্ব নয়। কেননা আমেরিকার দিক থেকে যে অভিযোগের অঙ্গুলি বাংলাদেশের দিকে নির্দেশ করা হয়েছে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব খুবই খারাপ হতে পারে। তাই অন্যদের আর এক কদমও অগ্রসর হওয়ার সুযোগ না দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের উচিত হবে দ্রুত আমেরিকার আদালতে এই অর্থ জালিয়াতির প্রতিকার চেয়ে মামলা দায়ের করে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো। মনে রাখতে হবে উন্নত বিশ্বে মানুষ ভয় পায় একমাত্র আইনজীবী ও আদালতকে, অন্য কাউকে নয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনার কয়েকমাস আগে অনুরূপ একটি অর্থ জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছিল। সেখানেও একই কায়দায় ভুয়া সুইফট মেসেজ জালিয়াতি করে আমেরিকার একটি ব্যাংকে ইকুয়েডরের এক ব্যাংকের রাখা গচ্ছিত অর্থ থেকে ১২ মিলিয়ন ডলার জালিয়াতির মাধ্যমে সরিয়ে হংকং নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ইকুয়েডরের সেই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাংক চুরি হওয়া অর্থ ফেরত পাওয়ার উদ্দেশ্যে আমেরিকা এবং হংকং উভয় দেশের আদালতে মামলা দায়ের করেছে, যা এখনও বিচারাধীন আছে। বিষয়টি নিয়ে অন্য পরিসরে বিস্তারিত লেখার ইচ্ছা রইল।

লেখক : ব্যাংকার, টরেনটো, কানাডা
Nironjankumar_roy@yahoo.com

The Financial Express

19 APR 2017

Exchange Rate

April 18, 2017

The following were the commercial banks' rates to public for some selected foreign currencies with Bangladesh Taka in cash transaction on Tuesday.

Bank	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	80.5500	85.7128	100.3578	0.7353	80.0070	60.7317	60.7308
Janata Bank	80.5500	85.9933	100.7538	0.7239	80.4184	60.9456	60.9075
Agrani Bank	80.5800	86.1725	101.3690	0.7384	80.1650	60.7519	60.5511
Rupali Bank	80.5800	86.0500	101.1448	0.7367	80.8612	61.4727	61.0947
FCBs							
StanChart	80.9400	87.1898	101.7678	0.7471	82.2618	62.2890	62.2796
HSBC	80.9900	87.6216	102.3483	0.7445	81.7042	61.2358	62.0112
CBC	80.8900	86.6575	102.2126	0.7425	--	61.4946	62.4875
Bank Alfalah	79.5600	87.2535	100.2774	0.7220	81.4059	61.1867	63.0990
PCBs							
SEBL	80.9500	87.1518	102.4642	0.7415	82.0279	60.8959	61.4544
BRAC Bank	81.0400	87.1385	101.1980	0.7532	82.1687	62.7404	61.1440
Prime Bank	81.0000	87.3675	102.5558	0.7481	80.9953	61.1724	60.9913
AB Bank	81.0900	88.6650	102.5425	0.7509	81.3522	61.9129	--
Uttara Bank	80.9500	87.8405	101.4206	0.7441	80.3430	60.9694	60.9050

SCBs	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	79.6000	83.8512	98.6716	0.7121	78.5033	59.4431	59.3857
Janata Bank	79.6000	83.7037	98.5409	0.7185	78.8248	59.6953	59.6307
Agrani Bank	79.6000	83.5725	98.6530	0.7093	78.5856	59.4584	59.5761
Rupali Bank	79.6000	83.7645	98.3791	0.7116	78.4743	59.3194	59.2522
FCBs							
StanChart	79.9500	83.5985	98.1780	0.7107	78.5523	58.7839	58.7751
HSBC	80.0000	84.1716	98.6583	0.7130	78.7242	58.5458	59.4212
CBC	79.9000	82.9921	98.5007	0.7074	--	59.2115	58.9103
Bank Alfalah	78.6000	82.6951	95.8448	0.6821	76.9889	57.1560	58.7535
PCBs							
SEBL	79.9500	83.8811	98.8152	0.7124	79.2055	59.8275	59.6145
BRAC Bank	80.0500	83.7873	97.7215	0.7167	77.4020	61.3501	58.3290
Prime Bank	80.0500	83.9920	99.0974	0.7155	78.8248	59.6640	59.7886
AB Bank	80.1000	84.0563	98.1350	0.7118	78.5666	59.2116	--
Uttara Bank	80.0000	83.9409	98.4466	0.7206	79.2103	59.8460	59.7367

SCBs	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	80.6000	85.7660	100.4201	0.7358	80.2964	60.7994	60.7685
Janata Bank	80.6000	86.0250	100.7911	0.7241	80.4675	60.9681	60.9300
Agrani Bank	80.6000	86.1925	101.3939	0.7386	80.1748	60.7669	60.5661
Rupali Bank	80.6000	86.0712	101.1696	0.7368	80.8810	61.4878	61.1097
FCBs							
StanChart	80.9500	87.1985	101.7780	0.7472	82.2700	62.2952	62.2858
HSBC	81.0000	87.6316	102.3583	0.7450	81.7142	61.2458	62.0212
CBC	80.9000	86.7575	102.3126	0.7435	--	61.5446	62.5375
Bank Alfalah	79.6000	87.2973	100.3278	0.7223	81.4468	61.2175	63.1308
PCBs							
SEBL	80.9500	87.1518	102.4642	0.7415	82.0279	60.8959	61.4544
BRAC Bank	81.0500	87.1685	101.4480	0.7537	82.1987	62.7704	61.1740
Prime Bank	81.0500	87.4205	102.6179	0.7486	81.0449	61.2099	61.0288
AB Bank	81.1000	88.7150	102.5925	0.7519	81.4322	61.9929	--
Uttara Bank	81.0000	87.8935	101.4827	0.7445	80.3825	61.0069	60.9425

SCBs	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	79.4800	83.7247	98.5229	0.7110	78.3850	59.3535	59.2961
Janata Bank	79.3800	83.2628	98.1408	0.7156	78.5057	59.4537	59.3893
Agrani Bank	79.4500	83.4137	98.4666	0.7079	78.4369	59.3458	59.4637
Rupali Bank	79.4800	83.6375	98.2300	0.7105	78.3554	59.2293	59.1623
FCBs							
StanChart	79.7635	83.4035	97.9489	0.7091	78.3690	58.6467	58.6379
HSBC	79.8600	83.9516	98.4083	0.7129	78.5042	58.2958	59.2212
CBC	79.7136	82.5898	98.1140	0.7046	--	58.9812	58.6804
Bank Alfalah	78.2179	82.2931	95.3789	0.6788	76.6146	56.8782	58.4679
PCBs							
SEBL	79.9500	83.8811	98.8152	0.7124	79.2055	59.8275	59.6145
BRAC Bank	79.9418	83.6737	97.5890	0.7077	77.2969	61.2664	58.2488
Prime Bank	79.8321	83.7613	98.8266	0.7135	78.6089	59.5006	59.6252
AB Bank	79.8500	83.6612	97.6988	0.7087	78.2675	58.9689	--
Uttara Bank	79.8065	83.7227	98.0613	0.7180	78.9209	59.6191	59.5161

Notes: USD = US Dollar, GBP = Great Britain Pound, JPY = Japanese Yen, CAD = Canadian Dollar, AUD = Australian Dollar, SAR = Saudi Riyal, MYR = Malaysian Ringgit, AED = UAE Drham, KWD = Kuwait Dinar, QAR = Qatar Riyal, HKD = Hong Kong Dollar, SGD = Singapore Dollar, CHF= Swiss Franc, NA= Data Not Available, PLC= Public Limited Company, FCB= Foreign Commercial Bank, PCBs= Private Commercial Bank.